অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। অথঃ 'অতা' সমাচার ।।

কী এক লংকাকান্ড ঘটে গেলো বিশ্বের এগারোতম সুখী দেশটায়। যে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যদিও অভিনব নয় কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর এর খড়্গ এই প্রথম নেমে এলো। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর এভাবে হামলা হয়নি। সম্প্রতি রামু এবং উখিয়ায় যা ঘটলো তা কেবল এক দঙ্গল অসভ্য দুর্বৃত্ত কান্ডজ্ঞানহীন মানুষ নামের পশুর কাজ। বর্বরের কাজ। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাজার বছর পরও তাঁর অনুসারীরা যখন মেনে চলেছেন 'অহিংসা পরম ধর্ম' তখন তাঁদের উপর হিংসার লেলিহান ছড়িয়ে দিলো সেই অসভ্য বর্বরেরা। শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর উপর অশান্তির বিষ ছড়িয়ে দিলো। আমার লজ্জা হয় আমি কী করে সামনে দাঁড়াবো এ শহরে আমার বন্ধু-স্বজন অভিজিৎ বড়ুয়া, পিয়াসা বড়ুয়া, সৌমেন বড়ুয়া, উদয় শঙ্কর বড়ুয়া, সুতপা বড়ুয়াসহ আরো অন্যান্যদের সামনে? আমার ব্যাডমিন্টন খেলার সাথী দেবাশীষ বড়ুয়ার চোখে চোখ রাখতে পারিনি সেদিন খেলার কোর্টে। খেলার শেষে যখন বাড়ী ফিরছিলাম তখন রথীন দা'র গলায় (রথীন্দ্রনাথ রায়) সিডনিতে শোনা সেই প্রিয় গানটার কথা মনে হচ্ছিলো বার বার - 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম'। মুক্তিযুদ্ধের সেই গানটাও মনে মনে গাইছিলাম - বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রীস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান - আমরা সবাই বাঙালি।

খবরে প্রকাশ - এ বাঙালি দুর্বৃত্তের দলে রোহিঙ্গারাই মূখ্য ভূমিকা রেখেছিলো যারা বৌদ্ধদের মন্দিরে, গৃহে হামলা চালিয়েছিলো। রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশের গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া। আশির দশক থেকেই এই রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ। শরণার্থী হিসেবে আমরাও বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম একাত্তরে। আবার দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর সবাই ফিরে এসেছি। কিন্তু এরা ফিরে যাবার জন্য আসেনি। তাই তখন মানবিক কারণে বসতে দেয়া হয়েছিলো - এখন শুয়ে পড়েছে। শুধু কী শুয়েই পড়া - তাদের প্রিয় দোসর জামাতীদের সহযোগিতা সমর্থনে গাঁট বেঁধে এখন নেমেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের। জামাতীরা উসকানী দেয় রোহিঙ্গা ভাই মিয়ানমারে বৌদ্ধরা তোমাদের থাকতে দেয়নি এখানে তোমরা ওদের উচ্ছেদ করে স্থায়ী হয়ে যাও। আমরা আছি তোমাদের সাথে। তা'হলে জামাতীদের স্বার্থটা কী? স্বার্থ হলো আমাদের সাথে থাকো লড়ো আমরা যেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করতে পারি। আমরা যেন আমাদের নেতাদের মুক্ত করতে পারি। প্রয়োজনে তোমাদেরকে নিয়ে আমরা এ অঞ্চলে আমাদের মত করে দেশ চালাবো। এদের হিসেব-নিকেশ অনেকদুর। দূর্নীতির কল্যাণে এদের অধিকাংশেরই এখন হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট। এ পাসপোর্ট নিয়ে অনেকেই বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। বিশেষ

করে হজ্বের নামে মধ্যপ্রাচ্যে চালান হয়ে গেছে। তবে এরা যেখানেই গেছে সেখানেই অশান্তি ডেকে এনেছে।

গত বছর মীনাতে দেখেছি মীনার বাজারে এই রোহিঙ্গা ভরা। সাথে আছে আফ্রিকার কিছু নারী পুরুষ। সবাই রাস্তার ধারে চাটাই পেতে ব্যবসা করছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। ভাবলাম আমার দেশের মানুষ। একটু আলাপ করি। বললো আমরা বাংলাদেশের লোক এখানে ব্যবসা করি। কয়েক বছর ধরে আছি। খানিক পরে অপর এক ব্যবসায়ী যিনি জন্মগত সূত্রে চট্টগ্রামবাসি বললেন ভাই এরা সব রোহিঙ্গা। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে কেমনে আসছে জানিনা কিন্তু এদের কাজ কারবারে আমাদের মান ইজ্জত শেষ। কারণ ওরা হজ্ব-ওমরার নামে এসে বেআইনিভাবে রয়ে গেছে আর যত বদনাম হচ্ছে বাংলাদেশের। এরা অনেক দুইনম্বরি কাজ করে যার কারণে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এরা দেশে অশান্তি করে -এখানেও তাই।

তাই এখনই এদের না রুখলে ওরা ক্যান্সারের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিহারীদের মত চিরস্থায়ী বিষ ফোঁড়া হয়ে থাকবে। তবে একটা কথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক তা হলো সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি না খুঁজে মূল সমস্যায় হাত দেয়া উচিত। রামু উখিয়ার ঘটনায় যেমন রাজনৈতিক 'ব্লেইম গেম' চলছে তাতে করে রোহিঙ্গাদেরকেই যেন প্রোটেকশন দেয়া হচ্ছে। শুধু এ ঘটনা কেন - দেশে যাই ঘটুক এমন কী পারিবারিক কলহ হলেও সেখানে সেই রাজনীতি - সেই "অতা"। পাঠক ভাবছেন এটা আবার কী কথা 'অতা"! এর অর্থ কী?

তা'হলে ব্যপারটা খোলাসা করি। আমার বড় জেঠী এবং মেজো জেঠীর মধ্যে ছিলো দারুণ অমিল। সব সময়ই একটা ঠান্ডা লড়াই চলতো। বড় জেঠী যেমন চাপা স্বভাবের তেমনি মেজো জেঠী ছিলেন ঠোঁট কাটা। যা বলার সামনে বলে দিতেন। ফলে মেজো জেঠীদের বাড়িতে খারাপ কিছু ঘটলেই তিনি দু'চোখ বড় করে, দু'ঠোট এক জায়গায় এনে একটা চাপ দিয়ে আঙ্গুলটা বড় জেঠীদের বাড়ীর দিকে নির্দেশ করে বলতেন - ওই অতারা (ওরা) এটা করছে (ওদের নামও নেবেন না), অতাগো মুখদোষ লাগছে, অতারা হিন্নালী করের হিয়ার লাই এগুন হর (ওরা হিংসা করছে তাই এসব হচ্ছে) ইত্যাদি। তবে বেশীরভাগ সময়ে অতারা না বলে বলতেন 'অতা'। তো আমরাও ছোট বেলায় মজা করার জন্য ইচ্ছে করেই জেঠীমা কে বলতাম - এবার আপনাদের নারকেল গাছে তেমন নারকেল দেখছি না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই পরিচিত ভঙ্গিতে বলতেন - বুইঝঝনি ওই 'অতা'।

তো আমাদের অবস্থা হয়েছে তাই। যা কিছু ঘটুক দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বলবে ঐ 'অতা'। ব্যাক দোষ ঐ 'অতাগো"। ফলে আসলে যে কার দোষ বা আসলে কী ঘটেছে তা বোঝার উপায় নেই। জানার পথ নেই। যে যেভাবে বোঝায় তাই বুঝতে হয়। হলমার্কের দূর্নীতি, ডেসটিনির দুর্নীতি, ইলিয়াস আলীর গুম, পদ্মা সেতু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি, সাগর-রুনীর হত্যা, রামু উখিয়ার তান্ডব এই সব সাম্প্রতিক ঘটনা গুলোর পিছনে যেন সেই 'অতা' কাহিনী। অর্থাৎ এ বলে ওদের কারণে ও বলে ওরা দায়ী। আমাদের দৈনিকগুলো যদিও সবাই নিরপেক্ষতার

দাবিদার কিন্তু তলে তলে প্রত্যেকটাই কমবেশী পক্ষ অবলম্বন করে বসে আছে। ফলে কাগজগুলোও বলে 'অতা'র দোষ। রাজনৈতিক দলের এরা যদি বলে ও চোর তবে ওরা বলে ও দেশ প্রেমিক। এরা যদি মাত্র একজন 'জজমিয়া' খুঁজে পায় তো ওরা খুঁজে পায় সাতজন জজমিয়া। এরা যদি বলে আল্লার মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে তো ওরা বলে পুলিশের আছে যাবেন না তাহলে পুলিশ আপনাদের (সাংবাদিকদের) আর মারতে পারবে না। আবার সাবধান করে বলে ঈদের সময়ে বাসায় বড় তালা লাগিয়ে গ্রামের বাড়ী ঈদ করতে যাবেন (আরেকটা ঈদ এসে গেলো তাই কথাটা মনে পড়লো)।

হলমার্কের কথা উল্লেখ করলাম। কাগজে দেখলাম হলমার্কের তানভীর শুধু একশো কোটি টাকা খরচ করেছেন যাঁরা তাঁকে টাকা জালিয়াতিতে সাহায্য করেছেন তাদের খেদমত এবং মনরঞ্জের জন্য। এরা হাজার হাজার কোটি টাকা হালাক এবং হালাল করে ফেলেছে। আমার মাথায় আসে না হাজার কোটি টাকা মানে কত টাকা। ছোট বেলার কথা মনে হলো। কোটিপতি শুনলে মাথা ঘুরে যেতো। আমার দৌড় কোটিপতি দেখা পর্যন্ত কিন্তু হাজার কোটি টাকা সামনে কল্পনা করতে পারি না। তাই ভাবি এটা এমন একটা অংকের টাকা যা দিয়ে পদ্মা বা যমুনা সেতুর মত কিছু একটা বানানো যাবে হয়তো।

ডেসটিনির ব্যপারটা আরো অদ্ভূত। অদ্ভূত একারণেই যে এর সাথে এমন এক ব্যক্তিত্বকে আপাতদৃষ্টিতে সম্পৃক্ত দেখা যাচ্ছে যা মানতে খুব কষ্ট হচ্ছে। হলমার্কের তানভীর এলমুনিয়্যামের লোটা বদনা বিক্রি করতে করতে এবং পরবর্তীতে চুরি করতে করতে (মহা)^{১০০}চোর হয়েছে। কিন্তু ডেসটিনির প্রেসিডেন্ট লে. জে. (অব:) হারুন-অর-রশীদ বীরপ্রতীক, যিনি স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সোচ্চার সংগঠন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সাধারন সম্পাদক। সেই লে. জে. (অব:) হারুন কী করে আরেক হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেংকারীতে জড়িয়ে গেলেন। আমার বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়। আজ (১২.১০.১২) ইন্টারনেট পত্রপত্রিকায় তাঁকে কারাগারে নিয়ে যাবার ছবি দেখে খুব কষ্ট পেয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। এও-কী সম্ভব? জানিনা তিনি কী স্বজ্ঞানে এই কেলেংকারীতে জড়িয়েছেন নাকি বলির পাঁঠা! তবে পত্রপত্রিকা সূত্রে যা জানতে পারি তাতে একবারে ধোয়া তুলসীপাতা বলা যাবে না। এক টাকা চুরি করলেও চোর হাজার কোটি টাকা চুরি করলেও চোর। অবাক হতে হয় এমন হাজার হাজার কোটি টাকা সমূহ দর দর করে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক থেকে লোপাট হয়ে গেছে/যাচ্ছে কেউ বলার নেই ধরার নেই, ধরলোও না। আর ধরলেই তো সেই "অতা' কাহিনী - এগুলো আগের আমলের জঞ্জাল বা আগের আমল থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের আমলে এসে ধরা পড়েছে ইত্যাদি।

আমি আশা করি লে. জে. (অব) হারুন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে সৎ এবং নিষ্ঠাবান হিসেবে পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে একটা পুরোনো কথা মনে হলো। দু'হাজার ছয়ের ১৮ মে দৈনিক জনকণ্ঠের চতুরঙ্গ পাতায় আমার একটা লেখা বেরিয়েছিলো 'আমাদের দু'জন রাষ্ট্রদূত- কাছ থেকে দেখা' শিরোনামে। তো সে লেখায় আমি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের প্রাক্তন দু'জন রাষ্ট্রদূত

মির্জা শামসুজ্জামান এবং আশরাফ-উদ-দৌলাকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম। শুধু এ দু'জনকে নিয়ে লিখেছিলাম কারণ এঁদেরকে আমি খুব ভালো করে চিনতাম। পারিবারিকভাবেও আমাদের যাতায়াত ছিলো। আমি অন্য কোন রাষ্ট্রদূতের সাথে এঁদের তুলনা করিনি বা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যদের কথাও টেনে আনিনি। শুধু এ দু'জনের কোন কাজটা ভালো লেগেছে/ভালো লাগেনি এসব নিয়ে কথা বলেছি। এর সপ্তাহ খানেক পর ২৬ মে সেই চতুরঙ্গ পাতায় দেখলাম লে. জে. (অব:) হারুন-এর স্ত্রী লায়লা নাজনীন হারুন 'আমাদের দু'জন রাষ্ট্রদূত - কাছ থেকে দেখা' শীর্ষক লেখা প্রসঙ্গে" শিরোনামে আমার লেখার প্রতিবাদে একটা লেখা ছাপিয়েছেন। লেখার বিষয়বস্তু হলো - আমি কেবল ঐ দু'জন রাষ্ট্রদূতের কথাই লিখলাম আর কোন রাষ্ট্রদূতের কথা আমার মনে পড়লো না? আমি কী রাষ্ট্রদূত লে. জে. (অব:) হারুন-এর নানা সব সুকুমার কাজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত নই? এরপর তিনি গরুকে নদীর পাড়ে নিয়ে নদীর রচনা লেখার মত করে পুরো লেখাতে লে. জে. (অব:) হারুন-এর গুণ-কীর্ত্তন করে গেলেন। আর আমাকে দুষলেন আমি কেন লে. জে. (অব:) হারুনের কথা এবং তাঁর এই গুণাগুণের কথা লিখিনি। সমস্যা হলো আমিতো আমাদের সকল হাইকমিশনারদের প্রোফাইল লিখতে বসিনি। আমি শুধু ঐ দু'জন হাইকমিশনারের কিছু ভালো কাজের কথা লিখেছিলাম যে গুলো আমার ভালো লেগেছিলো।

যাহোক, পরবর্তীতে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরে দৈনিক জনকণ্ঠে ছোট্ট একটা কৈফিয়ৎ পাঠিয়েছিলাম যা তাঁরা ছাপেননি। বলেছেন এব্যপারটা নিয়ে তাঁরা আর এগোতে চান না। আমি ভাবলাম আমি সামান্য একজন সাধারণ কাইউম পারভেজ আর তাঁরা হলেন ভিভিআইপি। তাঁর মত এমন গুনীজনের কথা আমার হয়তো লেখা উচিত ছিলো কিন্তু সে গুণের কথা তো জেনেছিলাম তাঁর স্ত্রীর লেখা বেরুনোর পর। আগে তো এতো কিছু জানতাম না। যেমন এখনো জানতাম না যদি পত্র-পত্রিকায় ডেসটিনির কেলেংকারীর কথা না জানতাম। তবুও আমি আশা করবো তিনি সত্বর জামিনে বেরিয়ে এসে আইনী লড়াইয়ে প্রমাণ করে দেবেন তিনি নির্দোষ। তিনি লড়াকু বীর - বীরপ্রতীক - জানেন কী করে লড়তে হয়।

এগারোতম সুখী দেশটার উপর ঝড়-ঝাপটার শেষ নেই। বিভীষণরা তো ঘরেরই। যুক্তরাজ্যের বেসরকারি সংস্থা নিউ ইকনোমিক্স ফাউন্ডেশন ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছর সুখী দেশের তালিকা প্রকাশ করে আসছে। মানুষের গড় আয়ূ, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরিবেশগত প্রভাবসহ বিভিন্ন বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে তারা তৈরী করে "হ্যাপি প্লানেট ইনডেক্স"। সে ইনডেক্সে বাংলাদেশের স্থান ১৬১-র মধ্যে এগারোতে। ওরা মিথ্যে বলেনি। ওরা যাদেরকে সুখী বলেছে তারা বিভীষণদের দলের বাইরে। তারা হলমার্ক, ডেসটিনি, সাগর-রুনীর হত্যা এবং জজমিয়া খেলাধূলার বাইরে। তারা রামু উখিয়ার সন্ত্রাসীদের দলের বাইরে। তারা অল্পতেই তুষ্ট। শুধু চায় একটু নিরাপত্তা। একটু নিয়মিত পানি বিজলী গ্যাস এবং সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ। রাজনৈতিক টাউট বাটপার আর "অতা'দের কাছ থেকে দুরে থাকতে যাতে ওদের ছোট্ট একটু শান্তির মাঝে কোন রকম গুম, ফরমালিন, চাঁদার দৈত্য বাস-ট্রাকে চড়ে অকালে শেষ না করে দিতে পারে। খুব কী বেশী একটা চাওয়া?